অলৌকিক ভৌতিক রহস্য

সুধীন্দ্র সরকার

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচিপত্র

অলৌকিক গল্প	০৯-৪৮
মহাগুনাসের চূড়ায়	১১
হস্তান্তর	১৫
মুনিয়ার বিল	১৯
বাস্তু সাপ	২৪
নিবারণের সমস্যা	২৮
অ্যান্টিকের আড়ালে	৩৩
উল্কি	৩৭
ভুটানি সোয়েটার	৪৩

ভৌতিক গল্প ৪৯-৯৪

দেবতার গ্রাস ৫১
সুজন এসেছিল ৫৯
জুলি ৬৩
পুরাতন ভৃত্য ৬৮
দুর্ঘটনার রাতে ৭৪
অশরীরী টহলদার ৭৯
ভয় ৮৪
নফরচন্দ্রের বেড়াল ৯১

রহস্য গল্প ৯৫-১৫২

ছদ্মবেশী ৯৭
চোরে দারোগায় ১০৪
সিকিমি মুখোশ ১১০
স্বরভেদী শর ১১৮
সূর্য ধরা ১২৪
হীরকবন্দরে দুর্ঘটনা ১২৯
থ্যাঙ্ক য়্যু ডিটেকটিভ ১৩৬
কাকতাড়ুয়া ১৪২
মহিন্দরের লাঠি ১৪৯

মহাগুনাসের চূড়ায়

চড়াইয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে তাকালুম। বাবা সাবধানে লাঠি ঠুকতে-ঠুকতে উপরে উঠছিলেন। মাথা সামনে ঝোঁকানো। পাহাড়ের চড়াইতে উঠতে গেলে শরীরের ভার সামনে রেখেই হাঁটতে হয়। আর নামার সময় পেছনে। পাহাড়ে ওঠা-নামার এসব কায়দা-কানুন আমার বাবার কাছেই শেখা।

ওপরে উঠে চিৎকার করে বললুম, "বাবা আমি ফার্স্ট। তোমার আগেই মহাগুনাস্ টপে উঠে পড়েছি।"

আমার কথাটা পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

নীচে থেকে হাত তুলে বাবা কী যেন বললেন। বুঝতে পারলুম না। দূর থেকে মনে হল, খাড়াই পথে বাবার উঠতে কষ্ট হচ্ছে। আর, হবে নাই বা কেন? মহাগুনাস পাস তো কম উঁচু নয়! এভারেস্টের প্রায় অর্ধেক। অমরনাথের পথে এটাই সবচেয়ে উঁচু রাস্তা।

বাবা আমার কাছে এসে হাতের লাঠিটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "আর পারছি না। যাওয়ার সময় বেশ গেলুম। এখন ফেরার পথে দেখছি অবস্থা কাহিল।।" একটু দম নিয়ে ফের বললেন, "একটু জিরিয়ে নি।"

"এখনও যে মাইল-তিনেক পথ। যদি বায়ুযান চটিতে পৌঁছতে রাত হয়ে যায়?" আমি বললুম।

"এখান থেকে উতরাই পথ। তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।" বাবার গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছিল না। পাশে পড়ে থাকা সবুজ রঙের পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে পড়লেন বাবা।

সেই সঙ্গে আমিও। বাবার লাঠিটা আমার লাঠির সঙ্গে রেখে দিলুম। পাহাড়ি রাস্তায় এই লাঠিই একমাত্র চলার সঙ্গী। একবার হাতছাড়া হলে আর রক্ষে নেই।

একটু পরেই সন্ধে নামবে। পথের যাত্রীসংখ্যাও অনেক কম। আমাদের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অনেক আগেই এগিয়ে গেছেন। হয়তো এতক্ষণে বায়ুযানে পৌঁছেও গেছেন।

মুখে 'হোঁশ্ হোঁশ্' শব্দে হুঁশিয়ারি দিয়ে দুটো কুলি পিঠে মালবোঝাই দুটো খচ্চরকে ধাক্কা দিতে দিতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল।

বাবা একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "কিছু খেতে পারলে হত। খিদেতেই আমাকে কাবু করে দিয়েছে। হ্যাভারস্যাকে শুকনো খাবার যা ছিল সব শেষ। পঞ্চতরণী চটিতে পেট ভরে না খেয়ে খুব ভুল করেছি। পাহাড়ে হাঁটলে যে তাড়াতাড়ি সব হজম হয়ে যায়, সেটা খেয়ালই ছিল না।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর খিদে পায়নি?"

কথাগুলো বলে বাবা ঠাণ্ডায় কাঁপছিলেন।

খিদে তো আমারও খুব পেয়েছে। বাবাকে লজ্জায় বলিনি। এই দুর্গম তীর্থে বাবা প্রথমে আমাকে নিয়ে আসতে চাননি। পরে রাজি হয়েছেন। আমি বলেছিলুম, "তুমি দেখো, আমার কোনো কষ্ট হবে না। পাঁচদিন ঠিক হাঁটতে পারব।" কিন্তু এখন কী করি? কী খেতে দেব বাবাকে? এমনই জায়গা যে চটিগুলো ছাড়া রাস্তায় কিছুই মেলে না।

বাবা ফ্লাস্ক থেকে একটু চা খেলেন। চা শেষ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন চুপ করে। আমি ডাকলুম। সাড়া দিলেন না। শুধু মাথা নাড়লেন। বাবার ওই রকম অবস্থা দেখে আমার বুক টিপ্-টিপ্ করতে লাগল।

চারদিন একটানা হাঁটছি। রাতে চটিতে সামান্য শুধু বিশ্রামটুকু। চারপাশ থেকে যতরাজ্যের ক্লান্তি এসে আমাকেও চেপে ধরল। চোখ বন্ধ করে একমনে ডাকতে লাগলুম ভগবানকে।

হঠাৎ কানে ভেসে এল ঠুক্-ঠুক্ শব্দ।

চোখ খুলতেই দেখি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের দিকেই আসছেন। ভদ্রলোক আমাদের সামনে এসে একটু দাঁড়ালেন। কী যেন বলতে গেলেন। পারলেন না। ধপাস করে বসে পড়লেন হাঁটু মুড়ে। কোনো কথা বলতে পারছিলেন না তিনি। ঠাণ্ডায় কাঁপছিলেন হি-হি করে।

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোকের কাছে। তারপর ওঁর হাতটা মুঠিতে নিয়ে তালু ঘষতে-ঘষতে আমাকে বললেন, "সৌম্য, তুই এঁর পায়ের তলাটাও জোরে-জোরে ঘষ।"

আমি ভদ্রলোকের হান্টার-শু খুলে পায়ের তলাটা ঘষতে শুরু করলুম।

বাবা বললেন, "এই বয়েসে কেন যে দুর্গম তীর্থে আসে? সঙ্গে লোকজনও কেউ নেই দেখছি।"

কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক চোখ খুললেন। বাবা ফ্লাস্ক থেকে চা দিলেন। গরম চা-টা ওষুধের কাজ করল। উঠে বসলেন ভদ্রলোক। তারিফ করলেন চায়ের। বাবাকে হিন্দিতে ওঁর পরিচয় দিলেন। নাম কেশব সিং। চাকরি করতেন মিলিটারিতে। সঙ্গী কেউ নেই, একলাই এসেছেন অমরনাথ দর্শন করতে।

ওঁকে জিজ্ঞেস করলুম, "বাড়ি কোথায় আপনার?"

কেশব সিং হেসে হেসে উত্তর দিলেন, 'খোকাবাবু, সারা হিন্দুস্থানই আমার ঘর।"

আমি বাবার দিকে তাকালুম। ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলুম, এ আবার কেমন কথা?

বাবা মুচকি হাসলেন। "সৈনিক ছিলেন তো, তাই বোধহয় বলতে চাইছেন গোটা ভারতবর্ষটাই ওঁর বাড়ি।"

কেশব সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর ঝটপট উঠে দাঁড়ালেন। এত তাড়াতাড়ি যে উনি সুস্থ হয়ে যাবেন, আমি ভাবতেই পারিনি।

এরপর আরো অবাক হওয়ার পালা। কেমন করে জানি না, উনি আমাদের মনের খবরটা জেনে ফেলেছিলেন। উঠে দাঁড়িয়েই, তড়িঘড়ি ওঁর কাঁধের ঝোলা থেকে অনেকগুলো শুকনো খাবার বের করলেন। চিঁড়েভাজা আর বিস্কুট। বললেন, "আপনাদের খুব খিদে পেয়েছে, তাই না? এগুলো খেয়ে ফেলুন।"

আমি আর বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। কেশব সিং কি টেলিপ্যাথি জানেন? খাবারগুলো প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিলুম আমি।

বাবা কিছুক্ষণ ওঁর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

একটু ইতস্তত করে কেশব সিং বললেন, "ঠাণ্ডায় দাঁতের পাটি দুটো ঠক্-ঠক্ করছে। আপনার মাংকি ক্যাপটা দেবেন?"

বাবা মাংকি ক্যাপটা মাথা থেকে খুলতে শুরু করলেন।

"আপনার অসুবিধে হবে না তো?" জিজ্ঞেস করলেন কেশব সিং।

"না না।" বাবা মাংকি ক্যাপটা ওঁর হাতে দিয়ে বললেন, "খাবারগুলো দিয়ে আপনি যা উপকার করলেন।"

"বাযুযানে পৌঁছেই ফেরত দেব।" মাংকি ক্যাপে মাথা ঢেকে কেশব সিং কথাটা বলে পা বাড়ালেন।

বাবা চেয়ে রইলেন ওঁর চলার পথে। আমি দেখছিলুম বাবাকে। এই কনকনে ঠাণ্ডায় বাবা মাংকি ক্যাপটা দিয়ে দিলেন! ওটা কি আর উনি ফেরত পাবেন? চটিতে হাজার-হাজার তাঁবুর মধ্যে কেশব সিং আমাদের খুঁজে পাবে কোত্থেকে?

আমার পিঠে হাত রাখলেন বাবা। "ভদ্রলোক না চাইতেই এতগুলো খাবার দিলেন। মাংকি ক্যাপটা না দিলে অভদ্রতা হত। নে, খাবারগুলো চটপট শেষ করি।"

বাবা চিঁড়েভাজার ঠোঙাটা খুলতে শুরু করলেন।

পাহাড়ের উতরাইয়ের দিকে চোখ রাখলুম। কেশব সিংকে আর দেখতে পেলুম না। উনি পাহাড়ি বাঁকে হারিয়ে গেছেন।

চিঁড়েভাজা আর বিস্কুটেই পেট ভর্তি হয়ে গেল। জলের বোতল থেকে জল খেয়ে বাবা বললেন, "সাড়ে-চারটে বাজে। তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে। তিন মাইল যেতে রাত হয়ে যেতে পারে!"

কেশব সিংকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলুম আমরা।

দূরে দেখা যাচ্ছিল, বায়ুযান চটিতে অসংখ্য তীর্থযাত্রীর তাঁবু। তার কাছেই অনেকটা নীচে শেষনাগ হ্রদ। হ্রদের সবুজ রঙের জল অন্ধকারে কালচে দেখাচ্ছিল। হ্রদের পেছনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পাহাড়ের তিনটে চুড়োতে শেষ বিকেলের ফিকে আলো।

বাবার অফিসের বন্ধুরা টর্চ হাতে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন আমাদের। হই-হই করে দল বেঁধে ওঁরা আমাদের কাছে এসে পড়লেন। আমাদের কুলি বেডিং নিয়ে অনেক আগেই চলে এসেছিল, সে আমাকে জোর করে ওর কাঁধে চাপিয়ে নিল। বাবার অফিসের দুই বন্ধু পরেশকাকু আর শ্যামলকাকু বাবাকে একরকম কোলে করেই হাঁটতে শুরু করলেন তাঁবুর দিকে।

রাতে খেয়েদেয়ে তাঁবুতে শুতে যাব, ঠিক তখুনি পরেশকাকু বাবাকে একটা মোড়ক দিয়ে বললেন, "আপনার মাংকি ক্যাপ। এক সাধুবাবা আপনার নাম করে দিয়ে গেছেন।"

"সাধুবাবা!" বাবা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, "কখন?"

"বিকেল চারটে সাড়ে-চারটে হবে।" পরেশকাকু বললেন।

"চারটে সাড়ে-চারটে?" বাবার ভুরুদুটো কুঁচকে উঠল। বললেন, "আমি তো কোনো সাধুকে মাংকি ক্যাপ দিইনি। দিয়েছিলুম, কেশব সিং বলে এক ভদ্রলোককে। ভদ্রলোক এক্স-মিলিটারিম্যান।"

"হয়তো ওই সাধুর হাতে সে ফেরত পাঠিয়েছে।" পরেশকাকু বললেন।

"কিন্তু আমার নাম জানল কী করে? আমি তো কাউকে নাম বলিনি।" বাবা কাকুদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী আমার নাম বলেছিলেন ওঁকে?"

"না তো!" পরেশকাকু বললেন, "সাধুবাবা মাংকি ক্যাপটা দিয়ে বললেন, আপনারা পেছনে আসছেন। কিন্তু দু-ঘণ্টা কেটে গেল আপনারা আসছেন না দেখে, আমার চিন্তা হল। তাই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম।"

"হুম!" বাবা মাথা নিচু করে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপরে ঝটিতে আমার দিকে তাকালেন, "মহাগুনাস্ থেকে আমরা ক-টার সময় হাঁটা শুরু করেছিলুম?"

"ঠিক চারটে তেত্রিশ।" আমি বললুম।

"তাহলে?" বাবা তাঁবুর বাইরে তাকালেন। বাইরে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। দূর থেকে ভেসে আসছিল ভজনের সুর।

দেখলুম, বাবা চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন। কথাগুলো শুনতে পাচ্ছিলুম না।

আমার পরপর মন পড়তে লাগল অলৌকিক ঘটনাগুলো। প্রচণ্ড খিদেতে না চাইতেই খাবার। কেশব সিংয়ের নেওয়া মাংকি ক্যাপ ফেরত দিলেন একজন সাধু। সব থেকে আশ্চর্য লাগল, যে সময় বাবা মাংকি ক্যাপটা দিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ই সাধুবাবা পরেশকাকুকে কেমন করে বাবার নাম করে মাংকি ক্যাপটা ফেরত দিলেন। নিমেষে তিনমাইল পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে মাংকি ক্যাপটা কে কীভাবে নিয়ে এলেন?

কোনোটারই সঠিক উত্তর পেলুম না। বুদ্ধিতে কেমন যেন জট পাকিয়ে গেল। ডাকলুম বাবাকে। সম্বিত ফিরে পেয়ে বাবা চোখ খুললেন। ফের চোখ বন্ধ করে মাংকি ক্যাপটা দু-বার কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "এখন শুয়ে পড়। কাল সকাল থেকে আবার হাঁটতে হবে। চন্দনবাড়ি পেরিয়ে পহলগাঁওয়ে ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে।"

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম কেশব সিংয়ের কথা। কেশব সিং কী রক্তমাংসের মানুষ, না অন্য কেউ?

হস্তান্তর

রামহরিকাকুকে এখনও মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সাতদিনে এ কী চেহারা হয়েছে ওঁর। ওঁকে হঠাৎ এরকম দেখব ভাবতেই পারিনি। উশকো-খুশকো চুল। চোখ দুটো গর্তে ঢুকে গিয়েছে। ধোপ-দুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবির বদলে ময়লা ছেঁড়া পাজামা। কাকুর হঠাৎ এমন পরিবর্তন কেন? হপ্তাখানেক ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে দীঘায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। এরই মধ্যে এমন কী ঘটল। কী এত ভাবছেন উনি! কোনো বিপদে পড়েননি তো! পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম ওঁর কাছে।

রামহরিকাকু থাকেন আমাদের নীচের ফ্ল্যাটে। এক দূরসম্পর্কের বৃদ্ধ মামা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো আত্মীয় নেই ওঁর। মামার সঙ্গেই উনি থাকেন। মামার ঠনঠনেতে লোহালক্কড়ের দোকান। মামার বর্তমান উত্তরাধিকারী যদিও উনি, তবু ব্যবসা দেখা তো দূরের কথা, মামার দোকানেই যান না। এই নিয়ে মামার যদিও প্রকাশ্য অভিযোগ নেই, তবে মনে মনে উনি যে ভাগ্নের ওপর প্রসন্ন নন; সেটা দু-জনের উত্তপ্ত কথাবার্তা শুনলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। খুব দরকার ছাড়া বাক্যালাপ হয় না। মামা-ভাগ্নের যোগাযোগের সম্পর্ক রাখে বাড়ির সবসময়ের কাজের লোকটি। মামার ব্যবসায় না গিয়ে ডালহৌসিপাড়ার এক মারোয়াড়ি ফার্মে দশটা-পাঁচটার কেরানির চাকরি নিয়েছিলেন রামহরিকাকু। কারণ, লোহালক্কড়ের কাজে ওঁর অনীহা। রামহরিকাকুর সঙ্গে আমার বিশেষ খাতিরের হেতু অবশ্য অন্য। ইদানিং উনি গল্প লিখতে চেষ্টা করছেন। কোনো গল্প শেষ হলেই আমাকে পড়ে শোনান। যদিও ওঁর লেখা গল্প এখনও ছাপা হয়নি কোথাও। বড্ড কাঁচা লেখা। কেমন যেন স্কুলের রচনা লেখার মতো। তবু 'টু' শব্দ না করে শুনতে হয় আমাকে। কী করব! নইলে হয়তো মনে আঘাত পেতে পারেন উনি। তাছাড়া মাঝে-মধ্যে আমাকে চকোলেট দেন, সেটাও যদি বন্ধ হয়ে যায়?

"কাকু কী হয়েছে আপনার?" কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

সাড়া পেলুম না। বোধহয় আমার কথা শুনতে পাননি। দ্বিতীয়বার, ফের জিজ্ঞেস করলুম, "কী হয়েছে কাকু? অফিস যাননি? শরীর খারাপ?"

কাকু এবারও উত্তর দিলেন না। শুধু মাথাটা তুললেন। ওঁর ঘোলাটে চাহনি দেখে শিউরে উঠলুম। এমন চোখ তো আগে কোনোদিন দেখিনি। মাথাটাথা খারাপ হয়নি তো? স্কুলে যাওয়ার সময় দেখেছিলুম মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে। তখন অতটা গা করিনি। স্কুল থেকে ফিরেও একই ভাবে বসে থাকতে দেখে কৌতূহল চাপতে পারলুম না। জোরে চিৎকার করলুম, "কাকু!" তারপর ধাক্কা দিলুম ওঁকে। একটু থতোমতো খেয়ে কাকু নিজের হাতের চেটো মেলে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলুম। উনি কী কিছু চাইছেন নাকি? জিজ্ঞেস করলুম, " কিছু চাইলেন কি?"

"না।" কাকু ঘাড় নাড়লেন। হাতের চেটো দুটো আমার নাকের কাছে এগিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "সৌম্য দেখো তো আমার তালুর কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছ কিনা?"

কাকুর হাতদুটো উল্টেপাল্টে দেখে বললুম, "কই, নাতো?"

চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল ওঁর। বললেন, "ভালো করে দেখো!"

"না, কিছুই দেখছি না।" জোরে ঘাড় নাড়লুম আমি।